**গুজবে কান দিবো না, কানকেই পাহারা দিবো**

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

 “অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবসের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে” ২০০৮ সালের ৩ অক্টোবর হঠাৎ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে খবরটি, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় আতঙ্ক। অ্যাপলের শেয়ারের ব্যাপক দরপতন ঘটে, লেনদেনের প্রথম ঘন্টায় যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঘটনাটির সূত্রপাত হয়, যখন ১৮ বছরের অজ্ঞাতনামা এক যুবক সিএনএন-এর আই রিপোর্ট ওয়েবসাইটে খবরটি পোস্ট করে। কোনোরকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই কর্তৃপক্ষ সংবাদটি পরিবেশন করেছিল এমনটাই মনে করা হয়।

পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের মানুষ একটু বেশি আবেগপ্রবণ। আমরা বাঙালিরা আরো বেশি আবেগপ্রবণ জাতি। অতিদ্রুত আমরা অপরকে বিশ্বাস করে বসি। কারো কাছ থেকে কোনো তথ্য পেলে বা কোনো সংবাদ শুনলে যাচাই না করেই তার পিছনে ছুটতে থাকি। বিশেষ করে কোনো নেতিবাচক সংবাদ পেলে খুব দ্রুত তাকে নিজের করে নিয়ে পরম মমতায় বিকশিত করতে আমরা যথেষ্ট পারঙ্গম।

সেই নেতিবাচক তথ্য আমরা শুধু বিশ্বাসই করিনা, সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে জোরালো ভূমিকাও রাখি। এই গুরুদায়িত্ব পালনের ভাইরাস একজন থেকে আরেকজনের মাঝে সংক্রমিত হয় এবং গুজবের জের ধরে কে কত আগে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে নজির স্থাপন করতে পারি সে প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সামাজিক অস্থিতিশীলতা। এতে কারো ক্ষতি হলো নাকি কারো প্রাণ গেল এতো কিছু দেখার সময় থাকে না আমাদের। আর তাই আমাদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হুজুগে বাঙালি।

২০১৮ সালে ‘ডিকশনারি.কম’ এর টুইটে ‘বছরের সেরা শব্দ’ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ‘মিসইনফরমেশন বা ‘ভুলতথ্য’ শব্দটি। বর্তমান যুগে সঠিক তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে যেয়ে ‘ফেইক নিউজ’ শব্দদ্বয় লোক মুখে বারবার চলে আসে। সঙ্গে চলে আসে ‘মিসইনফরমেশন’ ও ‘ডিসইনফরমেশন’ শব্দ দুটি । ‘মিসইনফরমেশন’ ও ‘ডিসইনফরমেশন’ শব্দ দুটি পরস্পরের পরিপূরক নয়। এদুটির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

মিসইনফরমেশন সাথারণতঃ ভুল তথ্যকেই বোঝায় যা ত্রুটির কারণে সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ‘ডিসইনফরমেশন’ শব্দের অর্থ ইচ্ছেকৃতভাবে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো। যখন কোনো তথ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অতিরঞ্জিতভাবে বিকৃত করা হয় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ছক কষে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয় তখন তা ‘ডিসইনফরমেশন’। ‘ডিসইনফরমেশন’ শব্দের অর্থ নির্বিচারে ভুল তথ্য ছড়ানো, সত্যকে দূষিত করা, প্রোপাগান্ডা। ‘ফেইক নিউজ’ শব্দটি নতুন নয়, তবে ২০১৭ সাল থেকে এটি সারাবিশ্বে একটি হট টপিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি ‘ডিসইনফরমেশন’ বা ‘ফেইক নিউজ’ দেখে বিশ্বাস করে এবং এটি শেয়ার করে তখনই তা ‘গুজব’-এ পরিণত হয়।

রবার্ট এইচ কন্যাপ তাঁর ‘এ সাইকোলজি অব রিউমার’ গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক হাজারেরও বেশি গুজবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গুজবের তিনটি মৌলিক দিক চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি হলো মানুষের মুখ। গুজব এক মুখ থেকে আরেক মুখে প্রচারিত হয়ে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সময় ও মানুষ যত পাল্টাতে থাকে তত তা বিকৃত হয় বিভিন্নভাবে। দ্বিতীয় দিকটি হলো গুজবটি তথ্য প্রদান করে। তৃতীয় দিকটি হলো মানুষের মন গুজব দ্বারা প্রভাবিত হতে চায় ও গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটাকে এক ধরনের আসক্তিও বলা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানের ভাষায়, গুজব হলো এমন কোনো বিবৃতি যার সত্যতা অল্প সময়ের মধ্যে অথবা কখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অনেকের মতে, গুজব হলো প্রচারণার একটি উপসেট মাত্র। অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তড়িৎ গতিতে শহর থেকে গ্রামে কিংবা গ্রাম থেকে শহরে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী নিকোলাস ডিফনজো এবং প্রশান্ত বড়দিয়ার মতে যে কোনো গুজবের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে; এগুলো হলো: এতে অবশ্যই কোনো না কোনো তথ্য থাকতে হবে। কোনো মতামত বা মতবাদ বা তত্ত্ব গুজবে পরিণত হয়না। এটি হতে হবে প্রচারযোগ্য । এর তথ্য সূত্র নিশ্চিত করা যায়না বলে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। এর বিষয়টি প্রাসঙ্গিক এবং একেবারে সমসাময়িক হতে হবে। গর্ডন অলপোর্ট এবং লিও পোস্টম্যান তাঁদের গবেষণা গ্রন্থ ‘রিউমার সাইকোলজি’তে গুজব ছড়ানোর মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিবিড়ভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে অনিশ্চিত পরিস্থিতি, উদ্বেগ, তথ্যের গুরুত্ব, ঘটনাবলীর অস্পষ্টতা, সামাজিক অবস্থান গুজবের জন্ম দিতে ভূমিকা রাখে।

মার্ক টোয়েন বলেছেন, গুজব বা মিথ্যা সত্যের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তিনি যা বলেছেন আসলেই কি তা ঠিক? সাম্প্রতিক সময়ে এই গুজব ছড়ানোর ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া বড়ো ভূমিকা পালন করছে। এই মাধ্যমের সুবিধা হলো তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো গুজব ছড়াতে বেগ পেতে হয় না। যা মন চায় লিখে পোস্ট করা যায় এবং তা রকেটের গতিতে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম। সমস্যাটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্ব আজ এ সমস্যা মোকাবিলা করছে।

-২-

ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বস্ত সোর্স, সাংবাদিক এবং প্রচারমাধ্যম থেকে আমরা সংবাদ পাই, যারা কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর তথ্য প্রচারের প্রবিধান বা সম্পাদকীয় মান অনেকেই অনুসরণ করছেনা। এরই সঙ্গে তথ্য ও সংবাদ গ্রহণ ও প্রকাশ এবং বিনিময়েও ইন্টারনেট আমাদেরকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। তাই ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে যথেচ্ছ। এমআইটি’র গবেষকদের এ সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল ‘সাইন্স’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল ‘The spread of true and false news online’। ২০০৬ থেকে ২০১৭ সাল অবধি টুইটারে পরিবেশিত গুজব বা মিথ্যা তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখতে পান, উক্ত সময়কালে প্রায় ১ লাখ ২৬ হাজার গুজব ৩০ লাখ ব্যবহারকারী ৪৫ লাখ বার টুইট করেন!

ছয়টি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান টুইটগুলোর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে। সমস্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এইমতে উপনীত হন যে, সত্য ঘটনা বা তথ্যের তুলনায় মিথ্যা বা গুজব প্রচারিত হয় অনেক দ্রুতগতিতে এবং তার ব্যাপ্তি অনেক প্রসারিত ও গভীর। গবেষকদের মতে, গুজব দ্রুতগতিতে ছড়ানোর অন্তর্নিহিত কারণগুলো হলো- বিষয় বৈচিত্র্য এবং তথ্য বা ঘটনার অভিনবত্ব এর মূল কারণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে বাংলাদেশে মূলত ফেসবুকের বিকাশ ঘটেছে বেশি। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি, ফেইসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোনো মোবাইল ফোনে ফেসবুক অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ থাকায় ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। অশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত সব ধরনের ব্যবহারকারী রয়েছে ফেইসবুকে। উচ্চশিক্ষিত অনেক ব্যবহারকারীও বিজ্ঞানমনস্ক না হওয়ায় গুজবে কান দেয়। তাদের ধারণা ফেইসবুকে যে সূত্রে একটি সংবাদ এসেছে, এতে মিথ্যা তথ্য থাকার কথা নয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা, কোনো বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা, ভুল তথ্য প্রদান, অসঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য- এই চার ধরনের বিষয়কে গুজবের নেপথ্যের প্রভাবক হিসেবে শনাক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে ৷ আসলে অবাধ তথ্য প্রবাহের নামে আমরা ‘হেট স্পিচ’কে প্রমোট করছি৷ এটার পার্থক্য আমাদের বোঝতে হবে এবং আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে, অপরকেও শেখাতে হবে৷

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুজবের ডালপালা মেলেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পুণর্গঠনকালীন সময়ে বাংলাদেশ বিরোধীরা বারবার গুজব রটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যখন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তখনও স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন বিরোধী শক্তি বারবার গুজবের আশ্রয় নিয়ে দেশের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে নিরীহ জনগণকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে, কখনো অবকাঠামো উন্নয়নের যাত্রাকে রুদ্ধ করার জন্যে সেতুনির্মাণে শিশুর কাটা মাথা লাগবে বলে গুজব রটানো হয়েছে। কখনো সরকারের সাফল্য নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিখোঁজ - এর গুজবকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনো ব্যবসায়িক মুনাফা বাড়াতে অথবা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে পেঁয়াজের মজুদ নাই বলে প্রোপাগান্ডা চালোনো হয়েছে।

প্রতিবারই সরকার কঠোর হাতে এই অপচেষ্টাকে দমন করেছে। বর্তমান সরকার জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সফল হয়েছে। মাদক ও অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসা নির্মূলে সফল হয়েছে। এই সব সাফল্যকে ম্লান করতেই গুজবকে ব্যবহার করছে ষড়যন্ত্রকারীরা। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ যখন একটি মর্যাদার আসনে পৌঁছাতে যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়ন যখন দৃশ্যমান তখন আবারো একের পর এক গুজবের আঘাতে দেশকে টালমাটাল করে দেওয়ার অপচেষ্টা।

গুজব প্রতিরোধে সবসময় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি জনগণের মাঝে গুজব সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আমরা জানি, তথ্যের শূন্যতা গুজবের দাবানলের ব্যাপকতা বাড়ায়। গুজব প্রতিহত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো দ্রুততার সাথে প্রকৃত তথ্য জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছে বলেই জনমনের বিভ্রান্তি দূর হতে সময় লাগেনি। কেবলমাত্র এবছরই তথ্য অধিদফতর ২০টি তথ্যবিবরণী ও ১টি প্রেসনোট প্রকাশ করেছে যেখানে গুজবের তথ্যের বিপরীতে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

-3-

গুজব প্রতিরোধ ও অবহিতকরণ কমিটি গঠন করা হয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে। অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের এই কমিটি গুজব সনাক্ত ও প্রতিরোধে কাজ করছে। তথ্য অধিদফতর ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকছে। এই অধিদফতরেও ১১ সদস্যবিশিষ্ট গুজব প্রতিরোধ ও অবহিতকরণ সেল গঠিত হয়েছে। প্রিন্ট, ইলকট্রনিক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোকে সার্বক্ষনিক মনিটরিং-এর মাধ্যমে গুজব নিশ্চিতকরণ ও প্রকৃত তথ্য প্রচার কাজে এই সেল কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৭০ টি ফেইসবুক আইডি, ২৫টি ইউটিউব চ্যানেল, ১০টি অনলাইন পোর্টাল বন্ধ করা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের নেতৃত্বে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করা হয়েছে গুজব প্রতিরোধ কমিটি।

এগুলো সরকারের গৃহীত প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ। কিন্তু গুজব মোকাবিলায় সবার আগে দরকার জনসচেতনতা বাড়ানো। কোনটি সঠিক তথ্য, কোনটি ভুল তথ্য এবং কোন তথ্য ছড়িয়ে দিলে দেশ ও দশের ক্ষতি হতে পারে, মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারে, সেই সচেতনতা গড়ে তোলা একান্তই জরুরি।

এলক্ষ্যে রাজধানী থেকে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় গুজব প্রতিরোধে স্থানীয়দের নিয়ে কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটিতে শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক কর্মী, স্থানীয় যুবক ও মহিলা প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের উঠান বৈঠক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কার্যক্রম জনমত গঠনে সবসময বড়ো নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

মহল্লাভিত্তিক ছোটো ছোটো গ্রুপে আলোচনার মাধ্যমে ফেইসবুক ও ইউটিউবে প্রকাশ পাওয়া বিভিন্ন অপপ্রচারে পারস্পারিক সম্প্রীতি, গুজব, অশ্লীল ও সমাজবিরোধী এবং রাষ্ট্রবিরোধী পোস্ট প্রতিহত করতে সকল পর্যায়ের মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি করতে পারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এক্ষেত্রে মসজিদ কমিটির সদস্যদেরকেও সক্রিয় করে তুলতে হবে। যে কোনো গুজব ডালপালা মেলার সময় মসজিদ থেকে পাল্টা মাইকিং-এর ব্যবস্থা নিতে পারে।

ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুজব প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিদ্যমান অবস্থায় গুজব থেকে সতর্ক থাকার জন্য অভিভাবক ও কোমোলমতি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকগণ যেন সচেতন করে তোলেন, এই পরিপত্র থেকে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কমিউনিটি পুলিশকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি আনসার বাহিনী ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে দেশের মূল স্রোতধারার গণমাধ্যমগুলো। যে কোনো ভুল তথ্যের সন্ধান পেলে প্রকৃত তথ্য দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে তারাই সবার আগে গুজব মোকাবিলায় জরুরি ভূমিকা রাখতে পারে।

জনমনে যেন কোনোভাবেই অসত্য বা মিথ্যা তথ্য প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য প্রয়োজন ‘মিডিয়ালিটারেসি’র উদ্যোগ নেয়া। জনগণকে মিডিয়া ব্যবহার করার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষিত করতে হবে। তারা যেন ফেইসবুক বা ইউটিউবে পাওয়া তথ্যের প্রকৃত মান বা উৎস সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারে সে বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে। সরকার এই মিডিয়া লিটারেসির কাজটি সহজ করে দিতে পারে শিশু কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলামে বিশেষ অধ্যায় যোগ করার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের আইটি প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে জনগণের মিডিয়া সাক্ষরতার মান বাড়ানোর কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া খুবই জরুরি।

 ’চিলে কান নিয়ে গেছে’ বলে চিলের পিছে না দৌড়ে নিজের কানকে পরখ করে দেখবার মতো দায়িত্বশীলতা ও সচেতনতাবোধ জাগ্রত করতে হবে প্রতিটি মানুষকেই। নিজের কানকে যেন পাহারা দেয় মানুষ। তাতে সব কথা কানেও যাবেনা । গুজবও ডাল পালা মেলার সুযোগ পাবে না।

#

তারিখ: ২৭.১১.২০১৯ পিআইডি ফিচার